১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

পটভূমিঃ- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বৃটিশ ভারতের জনগণের জাতীয়তাবোধের উত্তরোত্তর উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ, দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশ ও ১৯১৯ সালের আইনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার শ্বেতপত্র নামক সংস্কার ঘোষণা করে। এটাই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এ আইনই পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের মূলভিত্তি রচনা করে। এসব দিক থেকে বিচার করলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯১৯ সালের মন্টফোর্ড আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙক্ষা পূরণে বিফল হয়। ফলে এ আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে তীব্র সমালোচনা আসে। এছাড়া ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩৫ সালের আইন অমান্য আন্দোরন দ্বারা কংগ্রেস যথাক্রমে স্বরাজ ও পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে। এতে বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করে নতুন সংবিধান প্রবর্তন না করা পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন দমানো যাবে না।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা তদন্ত করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৯২৮ সালের সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কিন্তু কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় কংগ্রেস ও লীগ উভয় দল এ কমিশন বাতিল করে। সাইমন রিপোর্টের পাশাপাশি পন্ডিত মতিপাল নেহ্রুরু সভাপতিত্বে একটি বেসরকারি কমিটি নেহেরু রিপোর্ট পেশ করে। এতে ভারতবাসীর আন্দোলনের কথাই প্রতিফলিত হয়। ১৯২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর গান্ধী-ডারউইন বৈঠকে ভারতের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ব্যাপারে আলোচনা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ভাইসরয় কোন আশ্বাস দিতে পারেননি। ২৯ জন অনুসারিকে নিয়ে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ গান্ধী সরব মাটি আশ্রম থেকে সমুদ্র সৈকতের দিকে যাত্রা শুরু করেন। ২৪ দিনে ২০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেন। এ মিছিল ডান্ডি মিছিল নামে পরিচিত। লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে গান্ধী দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরুর ইঙ্গিত দেন। আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে ছিল-(ক) লবণ আইন ভঙ্গ করা (খ) ছাত্রদের শিক্ষালয় এবং কর্মচারীদের সরকারি অফিস বর্জন (গ) মদ, অফিম ও বিদেশি পণ্য বর্জন (ঘ) কর খাজনা প্রদান বন্ধ ইত্যাদি। ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য তিনটি গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসকল বৈঠকের অনেক প্রস্তাব ও সুপারিশ ১৯৩৫ সালের আইনে রূপ লাভ করে।

১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ম্যাক ডোনাল্ড সম্প্রদায় ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীয় হন। সাংবিধানিক সংস্কারের নতুন পরিকল্পনাধীনে প্রদেশগুলো বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কি ধরনের কতখানি প্রতিনিধিত্ব প্রদান

করবে তা ছিল এ রোয়েদাদের মূল বিষয়। এ সাম্প্রদায়িক বোয়েদাদ ১৯৩৫ সালের আইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রদায়িক বোয়েদাদের ভিত্তিতে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলে তিনি তাদের জন্য আরও বেশি আসন বরাদ্দের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এজন্য তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন। তার জীবন রক্ষার জন্য হিন্দু নেতারা স্বেচ্ছায় ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে হরিজন নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং পুণা চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ সরকার ভারতের সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে তাদের সকল সিদ্ধান্ত ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে এক পার্লামেন্টারী শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সালে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রকাশিত হয়। এই খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৪ সালে সুবিখ্যাত ৩২টি ধারা সম্বলিত ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। সবশেষে আমরা বলতে পারি, ভারতের জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক দাবির মুখে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়।

বৈশিষ্ট্যঃ-

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো [Federal Government]: ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে ব্রিটিশশাসিত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ গুলিকে নিয়ে এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করা হয় । যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক হন গভর্নর জেনারেল । গভর্নর জেনারেল তাঁর মনোনীত তিনজন সদস্য নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করেন । এই তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের সাহায্যে গভর্নর জেনারেল ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, খ্রিস্টধর্ম সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করতেন । অন্যান্য বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় । মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকতেন । কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি ব্যাপার গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ নাও করতে পারেন । যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দুটি পরিষদ নিয়ে গঠিত হবে । উচ্চকক্ষের নাম হবে রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States) এবং নিম্নকক্ষের নাম হবে ব্যবস্থা পরিষদ (Federal Assembly) । রাষ্ট্রীয় পরিষদ একটি স্থায়ী সংসদ হবে এবং এর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রতি তিন বছর অন্তর কার্যকাল শেষ হবে এবং সেই জায়গায় নতুন সদস্য নেওয়া হবে । অবসর গ্রহণকারী সদস্যরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন । রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ২৬০ । এঁদের মধ্যে ১৫৬ জন ব্রিটিশ শাসিত ভারত থেকে নির্বাচিত হবেন এবং অনধিক ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যের শাসকদের দ্বারা মনোনীত হবেন । নিম্নকক্ষ ব্যবস্থা পরিষদ (Federal Assembly) পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হবে বলে ঠিক হয় । এর সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ৩৭৫ । ব্রিটিশ শাসিত ভারত থেকে ২৫০ জন এবং দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ১২৫ জন সদস্য পরিষদের জন্য নির্বাচিত হবেন ।

প্রাদেশিক শাসন [Provincial Government]:- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে ভারতবর্ষকে ১১টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয় । প্রত্যেক প্রদেশে একজন গভর্নর নিযুক্ত হয় । গভর্নর কেন্দ্রীয় শাসনে গভর্নর জেনারেল-এর অনুরূপ ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করবেন । আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যের মধ্য থেকে গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালানো হবে বলে স্থির হয় । প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কার্যকাল গভর্নরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল । তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারতেন । নতুন ভারত শাসন আইনে কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার ওপর ও অন্য কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন সভার ওপর ন্যস্ত হয় । প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়, মুদ্রাব্যবস্থা, যোগাযোগ, ডাক ও তার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে এবং স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হয় । কতকগুলি বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার ওপর আইন প্রণয়নের যুগ্ম দায়িত্ব দেওয়া হয় । একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠন করা হয় । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কাছে পেশ করার ব্যবস্থা হয় ।

গুরুত্ব ঃ- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের হতাশ করে এবং এই আইন নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয় । কংগ্রেস ইতোপূর্বে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিল । কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা, বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে কী না এই সব নানা বিষয়ে প্রশ্ন ও মতবিরোধ দেখা দেয় । এই সব প্রশ্নের মিমাংসার জন্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লখনউতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে । অধিবেশনে ঠিক হয়, কংগ্রেস সাময়িকভাবে এই শাসনবিধিকে অগ্রাহ্য করে একটি গণপরিষদের দাবি জানাবে । ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । নির্বাচন প্রচারের সূত্রে জনসাধারণ অধিকতর নিকটবর্তী হতে এবং তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয় । এই অধিবেশনে আরও স্থির হয় যে, নির্বাচনী প্রচারের সময় এবং নির্বাচনের পরে কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল আইনগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে এবং গোল টেবিল বৈঠকে আলোচিত দাবি দাওয়ার সপক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করবে । ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্বাচনে সাধারণ নির্বাচন ক্ষেত্রসমূহে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে । এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে সক্ষম হয় । মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রগুলিতে মুসলিম লিগ প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি । মুসলিম লিগ কিছু সংখ্যক আসনে জয়ী হয় । মুসলিম লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করে । মুসলিম লিগ দলের নীতি ও কর্মসূচির সঙ্গে কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচির মিল না থাকায় কংগ্রেস যথারীতি যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে । কংগ্রেসের এই ঘোষণায় মুসলিম লিগ নেতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন । এরপর মুসলিম লিগ নেতা কংগ্রেস বিরোধী ও মুসলমানদের

জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেন । ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে মুসলমান, তপশিলি জাতি, খ্রিস্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের আলাদা নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয় । শিখগণ পৃথক নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেন । উপরিউক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় ছাড়া অপরাপর লোকদের সাধারণ নির্বাচক হিসাবে রাখা হয় । ব্রিটিশ সরকার এই সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে ভারত বিভাগের পটভূমি রচনা করে ।

তথ্যসুত্রঃ-
আধুনিক ভারতঃ ১৮৮৫-১৯৪৭- সুমিত সরকার
আধুনিক ভারত- পলাশী থেকে নেহেরু (১৭৫৭-১৯৬৪) – সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়
E-resource